গুন্দলীপাহাড়ের ঝিঙেফুলী

সব্যসাচী সরকার

১

জীবনে এক একটা আতঙ্কের মুহূর্ত অনেক সময় জানান দিয়ে আসে না। ঘটনাটা ঘটতে পারে জানতে পারলে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে সেটার সম্মুখীন হওয়া যায়। তবে আকস্মিক আতঙ্কিতক্ষণকে হয়তো ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিতে হয়। অনেক বছর আগে আমার জীবনে এই রকমই এক আকস্মিক ঘটনা ঘটেছিল। তবে কথায় বলে - সব ভালো যার শেষ ভালো - আর আমার ভাগ্যে সেটা হয়েছিল বলেই এই স্মৃতিচারণ সম্ভব হল। ঘটনাটা বলি - মনে হয় আপনাদের ভালো লাগবে।

২৫-শে ডিসেম্বর, ১৯৬০-এর এক রবিবারের সকাল। বড়দিনের কলেজ ছুটিতে বাড়ীর উঠোনে বসে শীতের রৌদ্রে আমেজের সঙ্গে একটা আখকে দাঁত দিয়ে কায়দা করার চেষ্টা করছি, এমন সময় অবিনাশের ছেলে হলধর, দাদুর লেখা একটা চিঠি আমার হাতে দিল। হলধর আমাদের ভাগচাষীর ছেলে। আমাদের ধানের জমিগুলো বাড়ী থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে রাজেয়া নামে একটি পাহাড়ী নদীর ধারে। ভয়ঙ্কর রকম গ্রাম্য জায়গাটির নাম গুন্দলীপাহাড়ি। কয়েকটি মাটির ঘর ও একটি বেনেদের ছোট্ট দোকান, যেখানে চিনি বা চা-ও পাওয়া যায় না। এসব জিনিষ আনতে গেলে গ্রামের উত্তর-পূর্বে আমাদের সাবডিভিসনাল শহর, জামতাড়া থেকে আনাতে হয়। সেখান থেকে আসা বা যাওয়া সোজা নয় - চারটি পাহাড়ী নদী আর ১২ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে পড়ে। যাতায়াতের উপায় পায়ে হাঁটা, গরুর গাড়ী বা ফোর হুইল জীপ। প্রতি বছর দাদু হেমন্তের শেষে থেকে মকরসংক্রান্তি পর্যন্ত গুন্দলীপাহাড়িতে আমাদের খামারবাড়ীতে থাকেন ভাগচাষের ব্যবস্থা করতে। বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য দাদুর সম্বল একটি ট্রানজিস্টার রেডিও আর প্রতি সপ্তাহের রবিবারের হাটের দিন হলধরের মাধ্যমে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় রসদ লিস্ট মারফৎ মায়ের কাছ থেকে যোগাড় করা। এর সঙ্গে বোনাস হিসেবে এক সপ্তাহের পুরোনো খবরের কাগজ। খবর পুরোনো হলেও গুন্দলীপাহাড়ির মতো জায়গায় দুপুরের খাবারের পর কাগজগুলোর সংবাদ পড়তে ভালই লাগে। আমরা সাধারণতঃ সবাই মিলে ৩১ বা ১ তারিখে চড়ুইভাতি স্টাইলে গুন্দলীপাহাড়ি বেড়াতে যাই। তাই দাদুর চিঠিতে যখন জানতে পারলাম যে এবার এক হরিণের পাল এসে পাকা ধান গাছ নষ্ট করছে এবং রাত্রিতে লোকেরা পালা করে পাহারা দিয়ে ও আওয়াজ করেও সুফল পাচ্ছে না, তখন বুঝলাম দাদু আমার কাছে কী চাইছেন। চিঠির ভাষাটা ছিল কিছুটা এই রকম,-----

"....নদীর বুকে বসে থাকা বালি হাঁস প্রতিবারই তো শিকার করার চেষ্টা করো। এবার একটু আগেই চলে এলে সবারই কল্যাণ হবে। ধান তো বাঁচবেই আর হরিণ মারতে পারলে বড়ধরণের শিকার করার হাতেখড়ি হবে। রাজী থাকলে আমার ডবল ব্যারেলের পার্ডিটা আর বি বি (B B) কার্টিজ এক নম্বরের কয়েকটা নিয়ে আনলেই হবে।" হলধর পর্যন্ত উৎসাহিত, বললে যে আমার স্কুলের সহপাঠী, গোবিনও (গোবিন্দ টুডু) আমাকে নিশ্চয় করে আসতে বলেছে।

দাদুর মুখে গল্প শুনেছিলাম যে তাঁর বাবা লালমুখো Magistrate সাহেবের কাছে ৫০টি কুইন ভিক্টোরিয়া থাকা মুদ্রার থলির বদলে এক বিশাল জমির স্বত্ব পান। একা অতজমি কি করবেন ভাবতে গোবিন ও হলধরের পূর্বপুরুষ দাদুর বাবাকে জমির চাষে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে এবং বিনিময়ে তিনি তাঁর জমি সমানভাবে তিনভাগ করে দুভাগ তাদের দান করে দেন। পর্যাপ্ত শীতবস্ত্র যাতে গায়ে থাকে এবং ঠাণ্ডা না লাগাই এই শর্তে মায়ের কাছ থেকে যাবার ছাড়পত্র পেলাম। হলধর আমার কয়েকমাসের না ব্যবহার করা সাইকেলটা পরিষ্কার করে হাওয়া ভরিয়ে ঠিক করেদিল। আমি একটা ব্যাগে কিছু জামাকাপড় আর সঙ্গের বন্দুকে ব্যবহার করার জন্য বি বি টাইপ কার্টিজ এক ও দু নম্বরের গোটা দুয়েক করে নিয়ে নিলাম। হঠাৎ মনে পড়লো - বড়মামা একবার বলেছিলেন যে বড়জন্তুকে কাছ থেকে একেবারে ঠাণ্ডা করে দিতে পারে এল জির কার্টিজ এক আউন্সের সীসের গুলি- তাই দুটো এল জি কার্টিজ এক নম্বর নিয়ে নিলাম। এখন এল জি র ব্যবহার ভারতে নিষিদ্ধ।

দুপুরের খাওয়া সেরে আমি ও হলধর দুই সাইকেলে গুন্দলীপাহাড়ির দিকে রওনা হলাম- একে পাহাড়ি রাস্তা তার উপর পিঠে বন্দুক ও ক্যারিয়ারে ৪-৫ কিলোর ব্যাগ। রাস্তায় তিন নদী ও অবশেষে রাজেয়া পেরিয়ে

যখন দাদুর আস্তানায় পৌঁছলাম তখন শীতের সন্ধ্যা নেমে এসেছে। পাথর ও মাটি দিয়ে তৈরী খামার বাড়ী, উপরে খড়ের চালা। ভেতরে খড়ের পুরু গদির উপর তোষক ও চাদর কম্বল। ঠাণ্ডাটা ভালই পড়েছিল কিন্তু ভেতরে কাঠকয়লার আগুনের গরম।

দাদু আমাকে দেখে খুবই খুশি, বললেন আজ আমার কোনো কাজ নেই, হরিণ তাড়ানোর ওরা যে ব্যবস্থা নিয়েছে তাই চলবে। আমি যেন খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ি। পরদিন সকালে প্ল্যান করে কাজ আরম্ভ করা যাবে।

সোমবারের সকাল। গ্লাস দুয়েক আখের রস খেয়ে মাচুলী (দড়ি দিয়ে বোনা বসার পিড়ে জাতীয়) বসে আছি উঠোনে। দাদুর ট্রানজিস্টারে বিজন বোসের বাংলায় খবর পড়া আরম্ভ হয়েছে আর নারান (দাদুর রাধুনী ও অন্যান্য কাজের সঙ্গী) খেতের বেগুন ও কপি তুলে নিয়ে বেসন দিয়ে তেলেভাজা তৈরী করছে মুড়ি সহ ব্রেকফাস্ট পরিবেশনের জন্য। এমন সময় দাদু ধানের ক্ষেত পরিদর্শন করে হলধর, অবিনাশ ও গোবিন্দের সঙ্গে ফিরে এলেন। মুড়ি ও তেলেভাজা খেতে খেতেই সবাই একমত যে হরিণগুলোকে তাড়াতে গেলে বন্দুকের ব্যবহার করতেই হবে। ঠিক হল রাত্রে আমি ক্ষেতে অপেক্ষা করবো। আকাশে চাঁদ আছে, আলোর অভাব হবে না হরিণগুলোকে দেখতে।

গোবিনের সঙ্গে জায়গাটা দেখতে গেলাম। তিন রকমের ধেনো জমি হয় পাহাড়ি জায়গায়। সব থেকে উঁচু জমিকে 'বাদ' জমি বলে যার ধান প্রায় কালীপূজোয় তৈরী হয়ে যায়। তার থেকে নিচু জমির নাম 'কানালী' এবং এগুলোতে নভেম্বর - ডিসেম্বরে ধানে পাক ধরে। সব থেকে নিচু ও ভালো জমি 'বহাল' এবং এতে ধান বেশী হয় আর প্রায় জানুয়ারীতে তৈরী হয়। হরিণদের নজর এই ধানের উপর পড়েছে। ক্ষেতে গিয়ে দেখলাম যে বেশ কিছুটা করে শীষযুক্ত ধান যেন কেউ কেটে নিয়ে গেছে আর তার থেকেও বেশী ধান গাছ পায়ে মাড়িয়ে একেবারে ভিজেমাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। চাষীদের করুণমুখ দেখে তাদের দুঃখ বুঝতে পারলাম।

ঠিক করলাম আজ রাতেই ক্ষেত পাহারায় বসবো। ক্ষেতের মধ্যে মাচা বাঁধা আছে এবং সেখানে চাষীরা পালা করে রাত্রে টিনের ক্যানেস্তারা বাজায়। আওয়াজের সঙ্গে হরিণেরা পালিয়ে যায় কিন্তু আবার আসে। এ যেন লুকোচুরি খেলা। সামান্য তন্দ্রার ফাঁকে বেশ কিছুটা মাঠের ফসল ওরা খেয়ে নষ্ট করে। দুপুরে খাওয়ার পরে বন্দুকটা ভাল করে পরিষ্কার করে একটু ঘুমিয়ে নিলাম। সন্ধ্যা নাগাদ সবাই বসে রাত্রির খাবার খেয়ে নিলাম। শীতের গ্রামের সন্ধ্যা আর কোনো শব্দ নেই। প্রায় রাত্রই ন টা নাগাদ আমি ও গোবিন ঐ এক মাচানের মধ্যে বসে পড়লাম। ভালরকম খড়ের গদি ও তার উপর চাদর পাতা। হাওয়া থেকে বাঁচার জন্য কয়েকটি চাদর দিয়ে বসার জায়গাটার চারদিক ও মাথাটা ঢাকা। চাদরের ফাঁক থেকে টর্চ বা বন্দুকের নল সহজেই বার করা যায়। তবে টর্চের আলোর দরকার দেখি না। শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না রাত্রি, অন্তত ১০০ গজ পর্য্যন্ত সবই ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম। গোবিন গল্প করা আরম্ভ করলো। আমি শব্দ করতে বারণ করাতে ও হাসলো, বললে যে এতদিন এভাবেই ওরা গল্প করে পাহারা দিয়েছে ও হরিণেরা এসেছে। বরং গল্প করলে ঘুম থেকে রেহাই পাবো।

ঠিক কতক্ষণ আমরা স্কুলের গল্প করেছিলাম মনে নেই হঠাৎ সামনের মাঠের বাঁ দিকে কিছু ধানগাছের নড়াচড়া দেখতে পেলাম। গোবিন বললে - "এসে পড়েছে"- আমরা কথা বন্ধ করলাম। বন্দুকের দুই ব্যারেলেই বি বি একনম্বর কার্টিজ ভরেছি যার এক আউন্সের একটা গুলিতে অনেকগুলো বড় বড় সীসের বল থাকে। আর হরিণ মারা আমার ঠিক উদ্দেশ্য নয়- ওদের শুধু ভয় দেখাতে হবে। এবার জ্যোৎস্নারাত্রে দলটাকে দেখতে পাচ্ছি। তাদের দেহেরভারে ধানগাছগুলো মাটিতে শুয়ে পড়েছে। ভাল করে বন্দুকের মাছিটা সামনের বড় হরিণটার কাঁধ বরাবর নিশানা করে ট্রিগার টানলাম। নিস্তব্ধ রাত্রিতে বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে হরিণটা পড়ে গেল। গোবিন বললো গুলি লেগেছে। এর সঙ্গে হরিণের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পালালো ও পাড়ার কুকুরগুলো তারস্বরে ডাক দিতে লাগলো। আমি ও গোবিন মাচা থেকে নেমে টর্চ জ্বেলে হরিণটা পড়ে যাওয়ার জায়গায় এগিয়ে গেলাম। হরিণটাকে দেখতে পেলাম না তবে প্রচুর রক্ত পড়ে আছে দেখলাম। গোবিন বললে, "যাবে কোথায়, চল খুঁজে বার করি"। টর্চ জ্বেলে রক্তের দাগ ধরে ধরে কিছুদূর এগিয়ে গেলাম তবে ঘন্টাখানেক ধরে চেষ্টা করেও হরিণটাকে দেখতে পেলাম না। রাত তখন ১২ টা। শীত করছিল আর যেটা চেয়েছিলাম সেটা হয়েছে। বোধহয় হরিণেরা আর এ তল্লাটে আসবে না। সকালে একবার খুঁজে দেখবো এই বলে দুজনে নিজের নিজের বাড়িতে ঘুমোতে গেলাম। দাদু বললেন, " কি হে, বন্দুকের শব্দ অথচ খালি হাত", গুলি লেগেছে এবং সকালে খুঁজে দেখবো বলে শুয়ে পড়লাম। ভোর সাড়ে পাঁচটায় দরজায় শব্দ, উঠে দেখি আধো অন্ধকার আর গোবিন দাঁড়িয়ে, বললে- চল,

খুঁজে দেখি, যদি পাই তো গ্রামের লোকদের ভালো ফিস্ট হবে। বন্দুকটা হাতে নিলাম,যদি আহতই থাকে তবে ওটাকে যন্ত্রণা থেকে রেহাই দিতে হবে। আর বি বি গিলি নয়, বন্দুকের দুটো ব্যারেলেই এল জি কার্টিজ ভরে নিলাম। ভেবেছিলাম যে কাছ থেকে আহত হরিণটাকে একগুলিতেই শুইয়ে দিতে পারবো যাতে না ওর পিছনে দৌড়াতে হয়। এই এল জি কার্টিজ যে প্রাণ বাঁচানোর জন্য এতটা অপরিহার্য্য হয়ে উঠবে তখন ভাবিনি।

রাত্রিরের পুরোনো রক্তের দাগ ধরে ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। শেষ পর্যন্ত রাজেয়া নদীর ধার পর্যন্ত এসে থামলাম। তাহলে বোধহয় আহত হরিণ জল খেতে এসেছিল কিন্তু এপারে আর কোন দাগ দেখতে পেলাম না। নদীর ওপারে কিছুটা জায়গা জুড়ে ছোট ছোট ঝোপে ভর্তি। ভাবলাম নদী পেরিয়ে ওখানেই কোথাও লুকিয়েছে। নদী পার হয়ে গোবিন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে একদিকে হাত দেখালো, দেখলাম অনেকখানি জায়গাজুড়ে তাজা রক্ত পড়ে আছে। আমরা একমত যে হরিণটা নদী পেরিয়েছিল কিছু আগেই, কিন্তু কোন কারণে ক্ষতস্থান থেকে আবার বেশি করে রক্ত পড়া আরম্ভ হয়েছে। তাহলে সেটা কাছেই কোথাও হবে ভেবে নদীর পাড়ে উঠে পড়তেই মরা হরিণটাকে দেখতে পেলাম। সূর্য্য উঠে পড়েছে আর তার আলো ওর উপরে পড়েছে, আর ওটা ঠিক একটা ঝোপের সামনে পড়েছিল। ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছি যে অত তাজা রক্ত কিভাবে বেরোলো। এদিকে গোবিন সামনে এগিয়ে গেছে আর তখনই সামনের ঝোপের দিকে তাকিয়েই, " ঢুলাল পালা, ঝিঙ্গেফুলী " বলেই চিৎকার করে পিছন ফিরে দৌড়ে নদীর বুকে নেমে গেলো। আমি সামনের ঝোপে একটা নড়াচড়া দেখে বন্দুকটা সামনে করেছি কি বিদ্যুৎ বেগে একটা চিতা (ওখানের ভাষায় ঝিঙ্গেফুলী) গর্জন করতে করতে দুটো ছোটো লাফ দিয়েই সোজা আমাকে লক্ষ্য করে লাফ মারলো। আমি ঘটনার আকস্মিকতায় জায়গাটাতে একেবারে ল্যাম্পপোষ্টের মত দাঁড়িয়ে থেকে গেলাম। পিছন ফিরে দৌড়তেও পারিনি। কিন্তু সাধারণ জ্ঞানটা হারাইনি- চিতাটা ঠিক মাথার উপরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি বন্দুকটা উপরে ধরে ট্রিগার টানলাম ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাঁ দিকে ঝুঁকে একটু সরে গেলাম। একটা এল জি গুলি প্রায় পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জে চিতাটার মুখের ভিতরে ঢুকে চিতার মগজটা গুঁড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল আর ওটা আরও উঁচুতে উঠে আমার ডানধারে সশব্দে আছড়ে পড়লো। অন্য ব্যারেলের ট্রিগারে আঙ্গুল দিয়ে আমি চিতাটাকে দেখলাম। ওটা একেবারে নড়ছিলো না। আমি যখন ওর হাঁ করা মুখে গুলিটা করি তখনই দেখেছিলাম যে ভারী সীসের গুলিটা চিতাটার মাথার পিছন দিয়ে বেরিয়ে যেতে। বন্দুকটা ভীষণ ভারী লাগতে লাগলো আর ঘামে গোটা শরীরটা ভিজে গিয়েছিল। গোবিনের চিৎকার ও আমার ট্রিগার টানার সময়ের ব্যবধান এক মিনিটও পুরো হয় নি।

এমন সময় গোবিনের গলা শুনতে পেলাম। চীৎকার করে ও আমায় ডাকছে। ওকে উপরে আসতে বললাম। সাবধানে ও আমার পিছনে এসে দাঁড়ালো। চিতাটা পড়ে আছে দেখে ও এগোতে চাইলো না। আমি জানতাম যে ওটা মারা গেছে তবুও একটা ঢিল মেরে নিশ্চিন্ত হলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম গুলিটা তালুর ভিতরে ঢুকে মাথার পিছন দিয়ে খুলিটাতে একটা গর্ত করে বেরিয়ে গেছে। আশ্চর্য মিল দেখলাম উড়ন্ত হরিয়াল বা হাঁস বা চিতার মাথায় গুলি লাগলে। ব্রেন ড্যামেজ হলেই উড়ানের ফ্লাইটা যেন বেড়ে যায় আর মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাকে বলে ড্রপডেড।

এবারে হরিণটার কাছে গেলাম। গুলির ক্ষতগুলি ওর পেঠে ও সামনের পায়ের উপরে দেখলাম। কিন্তু চিতাটা ওর গলাটা ক্ষতবিক্ষত করে দিয়ে ওর মৃত্যু ঘটিয়েছিল। তাজা রক্তপাতের সেই ছিল কারণ। আরও লোক লাগবে বলাতে গোবিন গ্রামের দিকে দৌড়ে দিল। প্রায় আধ ঘন্টার মধ্যেই বেশ কিছু লোক দড়ি ও বাঁশ নিয়ে হাজির হল।

সকাল নটা নাগাদ আমাদের খামার বাড়ীতে মেলা বসে গেল। হরিণের গলা সমেত মাথাটা চিতার এঁটো বলে কেটে বাদ দেওয়া হল এবং সমস্ত বাকি মাংস গুন্দলীপাহাড়ি ও পাশের গ্রাম শুকজোড়ায় প্রত্যেক বাড়ী ভাগ করে দেওয়া হল। গফুরকে দিয়ে চিতার চামড়াটা ছাড়ানোর ব্যবস্হা করলাম। গুন্দলীপাহাড়ির একটি খালি মুদির দোকানে কিছু ফিটকিরি ও তুঁতে (কপার সালফেট) ও প্রচুর নুন পাওয়া গেল। ভালো করে দুটো চামড়ারই কাঁচা দিকটাতে ঐগুলোর গুঁড়ো ভালো করে লাগালাম আর একটা চটের থলিতে সেগুলোকে ভরে আসানসোলের বড়মামুর কাছে হলধরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। মামা বিগগেম জানেন ও ট্যাক্সি-ডার্মিস্ট -দের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে, তাই ওগুলো ভাল স্মৃতি চিহ্ন হয়ে টিকে থাকবে তা জানতাম।

নারায়ণকে আমাদের ভাগে পাওয়া হরিণের পায়ের মাংসটা, দাদু, ভাল করে ধুয়ে একটা মাটির হাঁড়িতে তুলে ও নুন মাখিয়ে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে মাটিতে পুঁতে রাখতে বললেন। এটা একটি বিশেষ দেশী ম্যারিনেসনের পর্যায়ে পড়ে। ফাইবার-যুক্ত হরিণের মাংসের প্রোটীন সময়ের সঙ্গে ভেঙ্গে গিয়ে অনেকটা মেটের মত খেতে লাগে। রান্নাটা পরের দিন হয়েছিল। সেদিন বাবা, মা ও অন্যান্য ভাইবোনেরা সবাই জীপে করে এসে হাজির। হলধর আসানসোল যেতে দাদুর চিঠি বাবাকে দিয়ে গেয়েছিলো - বিশেষ চড়ুইভাতির ডাক নিয়ে। এভাবেই এক লোমহর্ষক স্মৃতি হয়ে গেছে ১৯৬০-এর ২৭-এ ডিসেম্বর।

(সত্য ঘটনা)